The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXII, pp 351-368, ISSN 2306-3920

# জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের উষা পর্ব[১] (১লা মার্চ-২৫শে মার্চ, ১৯৭১) : একটি পর্যালোচনা

**খান মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম***
**তানভীর আহসান****

[**সার-সংক্ষেপ :** বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো ১৯৭১ সালের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হওয়ার পর পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের কর্তৃত্ব কিভাবে সমান্তরাল সরকার হিসেবে পাকিস্তানের অস্তিত্বকে বিলীন করেছিল; সেটা পরীক্ষা করা। আরও পরীক্ষা করা হবে রাজনৈতিক আন্দোলন কীভাবে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে রূপ নিয়েছিলো? গবেষণাটির ব্যাপ্তি ধরা হয়েছে ১লা মার্চ থেকে ২৫ শে মার্চ ১৯৭১। ইয়াহিয়া খানের ১লা মার্চে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পরই পূর্ববঙ্গীয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই মূলতঃ জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সূচনা। এই প্রতিক্রিয়া মূলতঃ তৎকালীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার অস্তিত্বকে টলিয়ে দিয়েছিল এবং পূর্ব বাংলায় শেখ মুজিবুর রহমানের সমান্তরাল সরকার পাকিস্তানের অস্তিত্বকে বিলীন করেছিল।]

**এক**

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারতের বিভক্তি হয় এবং পাকিস্তানের উদ্ভব হয়। এই বিভক্তিকে প্রায়ই ব্যাখ্যা করা হয় উদীয়মান মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং বিদ্যমান হিন্দু মধ্যবিত্তের বিরোধের প্রেক্ষাপটকে অবলম্বন করে। নবসৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল-প্রথমত : পাকিস্তান হলো ধর্মীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে উদ্ভব হওয়া প্রথম রাষ্ট্র। আধুনিক যুগে ধর্মীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একমাত্র রাষ্ট্র ইসরায়েল, যেটা পাকিস্তান সৃষ্টির এক বছর পর সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত : পরস্পর থেকে ১৫০০ কিলোমিটার দূরত্বে দু'টি ভৌগলিক টুকরো নিয়ে যে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রটি হলো যার পশ্চিমাংশ ভৌগলিক আয়তনের দিক দিয়ে বড় কিন্তু জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে পূর্বাংশ বেশী ঘনবসতিপূর্ণ। প্রকৃত অর্থে নবগঠিত পাকিস্তানের অধিকাংশ জনগণ পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করত। ১৯৫০ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ৭৮ মিলিয়ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৪৫ মিলিয়ন (৫৫%) পূর্ব পাকিস্তানে বাস বাস করত (Van Schendel, 2009:109)। এ ধরনের বেনজির বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল

---

* **খান মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম :** সহকারী অধ্যাপক (ইতিহাস), সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫।

** **তানভীর আহসান :** সহযোগী অধ্যাপক (সমাজতত্ত্ব), সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে পুরোভাগে থাকা মুসলিম লীগ স্বাধীনতার পরপরই অকেজো হয়ে যায়, ফলে ক্ষুদ্র একটি অভিজাত শ্রেণী ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে থাকে, যেখানে সাধারণ নাগরিকদের কোনো ভূমিকা ছিল না। ফলে স্বাধীনতার পর ভারত যেমন ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত চারটি (১৯৫২, ৫৭, ৬২, ৬৭) সাধারণ নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছে, তেমনি একটি সাধারণ নির্বাচন করতে পাকিস্তানিদের অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত (Jalal, Ayesha, 1997:47)। যেটিকে কেন্দ্র করে এর পূর্বাংশ স্বাধীন হয়ে যায়।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর একটি সাধারণ নির্বাচন করতে পাকিস্তানিদের যেমন ১৯৭০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে তেমনি নবসৃষ্ট রাষ্ট্রটির সংবিধান প্রণয়ন করতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের পরাজয় ঘটে এবং ২১ দফা দাবী নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়। এই ২১ দফার মধ্যে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দাবী ব্যাপক জনসমর্থন পায়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের পরিবর্তে সংখ্যা সাম্যের নীতি যুক্ত করা হয়। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন তা ছিল ১৯৫৪ সালের ২১ দফার ঘোষিত পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দাবির অনুরূপ (হাসান, মঈদুল ২০১৫:১০)।

কিন্তু আয়ুব খানের শাসনামলে (১৯৫৮-৬৮) সামাজিক পরিবর্তন এবং আধুনিকায়নের ফলে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর শক্তিশালী ও বহুমূখী বিকাশ রাজনৈতিক বিধি ব্যবস্থাকে উন্নত করে। অভিজাতদের আধিপত্য ক্রমেই সংকুচিত হতে থাকে (Jahan, Rounaq, 1994:39)। ১৯৬৮-৬৯ গণ আন্দোলনে আয়ুব খানের পতনের পর ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকার ছাত্র, শ্রমিক এবং পেশাজীবিদের আস্থা অর্জনের জন্য নতুন শিক্ষানীতি ও মজুরি নীতি ঘোষণা করে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দাবী অনুযায়ী সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন আয়োজন করে ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকার। সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল সামরিক আইনের অধীনে আইনগত কাঠামো আদেশে। যদিও সামরিক আইনের ধারায় ইসলামী আদর্শ, পাকিস্তানের অখণ্ডতা এবং জিন্নাহের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য দেয়া নিষিদ্ধি ছিল কিন্তু আওয়ামী লীগ ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং পূর্ব বঙ্গের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন এর পক্ষে প্রচারণা চালায় (Talukder, Moniruzzaman, 1980:74)। মার্চ ১৯৬৯ থেকে ডিসেম্বর ১৯৭০ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবুর রহমান ব্যাপক গণসংযোগ করেন।[২] নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগের ছয় দফা এবং ছাত্রদের এগারো দফার সমন্বয়ে একক দাবী 'স্বায়ত্বশাসন' ব্যাপক প্রচারণা পায়। পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্র সামরিক আইন নিয়ন্ত্রিত থাকলেও বিস্ময়করভাবে স্বাধীন রিপোর্টিং-এ কেউ বাধা প্রদান করলো না। শেখ মুজিব জাতীয়তাবাদ এবং প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে গেলেন। 'স্বায়ত্বশাসন' দাবী ততদিনে পূর্ববঙ্গের গণদাবী হয়ে গেল। ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ১৬২ আসনের মধ্যে ১৬০টি আসনে বিজয়ী হয় (Talukder, Moniruzzaman, 1980:72)।

১৯৭০-এর নির্বাচন ছিল পাকিস্তানের গণ মানুষের দাবী। কিন্তু নির্বাচন, সংকট উত্তরণের পরিবর্তে ১৯৭১ সালের রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। নির্বাচনের পরে ৩রা জানুয়ারি ১৯৭১-এ রেককোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে জনপ্রতিনিধিদের বেনজির একটি শপথ অনুষ্ঠানে 'ছয় দফা ভিত্তিক স্বায়ত্বশাসন এবং এগারো দফা কর্মসূচীর প্রতিফলন ঘটাতে সর্বশক্তি প্রয়োগের' ঘোষণা দেয়া হয়। এই কার্যক্রমের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রয়াসী যে কোন মহল এ অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে 'প্রতিরোধ আন্দোলন' এর জন্য 'যে কোনরূপ ত্যাগ' স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকার কথা বলা হয় (দৈনিক ইত্তেফাক: ৪-১-৭১)। নির্বাচনের ফলাফল অনুকূলে থাকায় এবং রেককোর্স ময়দানে এমন প্রকাশ্য শপথ অনুষ্ঠানে যে অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৫১ জন জাতীয় পরিষদ এবং ২৬৮ জন

পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ সদস্য উপস্থিত ছিলেন (দৈনিক ইত্তেফাক: ৪-১-৭১)। 'স্বায়ত্বশাসন' দাবী থেকে আওয়ামী নেতৃবৃন্দের সরে আসায় দৃশ্যত আর কোনো পথ খোলা রইলো না।

উচ্চ বেতন ও বর্ধিত সুবিধাদি নিয়ে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব ছিল অভিজাত গোষ্ঠীভুক্ত। ১৯৫০ এবং ৬০ এর দশকে সেনাবাহিনীর জন্য মোট বাজেটের অর্ধেক ব্যয় করা হত। পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানের সাথে একতাবদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর স্বার্থ ছিল। আওয়ামী লীগের কর্মসূচী অনুযায়ী সংবিধান তৈরী হলে পাঞ্জাবে ভূট্টোর জনপ্রিয়তার ব্যাপক ধস নামতো। পাঞ্জাবে ভূট্টোর প্রতিশ্রুতি ছিল শক্তিশালী সেনাবাহিনী, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভারতের বিরুদ্ধে হাজার বছরব্যাপী যুদ্ধ (Talukder, Moniruzzaman, 1980:77)।

এসব করণে ভূট্টো এবং সেনাবাহিনী জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন স্থগিত করে। ভূট্টো সিন্ধু এবং পাঞ্জাবের কার্ড ব্যবহার করে সারা পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ব বাংলা বিরোধী প্রচারণা চালান। ইয়াহিয়া খান, শেখ মুজিব এবং ভূট্টো কয়েক দফা আলোচনার পর ০৩ রা মার্চ ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকেন।

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষদিকে ভূট্টো ঘোষণা দেন তৈরি শাসনতন্ত্রের বৈধতা দিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবেন না তিনি। ২৮ ফেব্রুয়ারি ভূট্টো জাতীয় অধিবেশন স্থগিত করার জন্য খাইবার পাস থেকে করাচী পর্যন্ত হরতালের ঘোষণা দেন (Talukder, Moniruzzaman, 2003:89)। ভূট্টোর দাবী ছিল, এক : পরিষদ বিলোপ ও সামরিক আইন বহাল রাখা। দুই, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন উদ্বোধন বাতিল করা এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ১২০ দিনের যে সময়সীমা রয়েছে তা তুলে দেয়া (ঘোষ, শ্যামলী, ২০০৭:২৪৪)। ভূট্টোর প্রকাশ্য দাবী এবং সেনাবাহিনী তথা ইয়াহিয়া খানের প্রচ্ছন্ন কামনা জয়ী হয়, ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্টের ঘোষণার মাধ্যমে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটে ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হওয়ার পর পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের কর্তৃত্ব কিভাবে সমান্তরাল সরকার হিসেবে পাকিস্তানের অস্তিত্বকে বিলীন করে ছিল। আরও পরীক্ষা করা হবে রাজনৈতিক আন্দোলন কিভাবে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে রূপ নিল। প্রথম পর্বে ১লা মার্চ থেকে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কর্মসূচীর সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা, বিবৃতি, সাধারণ প্রশাসনিক অবস্থা এবং আন্দোলনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হবে। দ্বিতীয় পর্বে ১৫ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চের মধ্যে সংঘটিত ত্রিপক্ষীয় রাজনৈতিক সংলাপ প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক আন্দোলনটি কিভাবে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে রূপ নিল সেটি ব্যাখ্যা করা হবে।

## দুই

উষাপর্বের প্রথম পর্বে আলোচনা করা হয়েছে মূলত মার্চের প্রথম থেকে মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কর্মসূচীর সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা, বিবৃতি, সাধারণ প্রশাসনিক অবস্থা সর্বপরি আন্দোলনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে দেখানো হবে উক্ত পর্বে আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবুর রহমানের কর্তৃত্ব কিভাবে সমান্তরাল সরকার হিসেবে পাকিস্তানের অস্তিত্বকে বিলীন করেছিল।

ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অন্ধকারে থাকার প্রেক্ষাপটে ২৭ ফেব্রুয়ারি গভর্ণর আহসান ইয়াহিয়া খানকে পাঠানো একটি তার বার্তার পরিস্থিতি পুনর্মূল্যায়ন করার আহবান জানিয়ে এই বলে সর্তক করেন 'যদি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয় তাহলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং সাধারণ প্রশাসন নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাবে। অর্থনীতি, যা ইতিমধ্যে চূর্ণ বিচুর্ন এবং ভঙ্গুর হয়েছে, তা একেবারে ধ্বংসস্তুপে পরিনত হবে (Sisson and Rose, 1990:88)।

ভূট্টোর সুবিদিত ভাষণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। উক্ত ভাষণের পরে ২৮ ফেব্রুয়ারি বিকেলে গর্ভণর ভবনে আহসান শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দীন আহমদকে জানান, রাষ্ট্রপতি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন। আহসান তাঁদেরকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে বলেন, এটা স্বল্পতম সময়ের জন্য। শেখ মুজিব প্রতিক্রিয়ায় বলেন 'কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র তাঁকেই ধ্বংস করবে না, পাকিস্তানকেও ধ্বংস করছে (Sisson and Rose, 1990:89)। আনুষ্ঠানিক মিটিং শেষে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে শেখ মুজিব অনুরোধ জানান, যে রাষ্ট্রপতি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যেন নতুন তারিখ ঘোষণা করে, তা না হলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

আনুষ্ঠানিক বৈঠক শেষে গভর্ণর আওয়ামী লীগ নেতাদের আহ্বানে অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু টেলিফোনে তাঁকে না পেয়ে একটি তারবার্তা পাঠান। তারবার্তাটির শেষাংশ ছিল 'একেবারে শেষ মূহুর্তে এসে আমি স্থগিত জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের একটি নতুন তারিখের জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি ...অন্যথায় আমাদের পিছন ফিরবার পথ থাকবে না (Sisson and Rose, 1990:90)। এরপরই গভর্ণর হিসেবে অব্যাহতি পত্রের তারবার্তা পান আহসান, তাঁর স্থলাভিসিক্ত হন ইয়াকুব।

এরকম পরিস্থিতিতে ০১মার্চ ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া খান ০৩রা মার্চ ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন পরবর্তী কোন তারিখ ঘোষণা ছাড়াই। ইয়াহিয়া খান তার বিবৃতিতে উল্লেখ করেন সামরিক আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর পূর্ণ সুযোগ দেয়া হয়। দীর্ঘ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী প্রচারণা শেষে জাতীয় নির্বাচন শেষ হয় ১৭ই জানুয়ারি, ১৯৭১। তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আমার আহবান ছিল নির্বাচন এবং জাতীয় পরিষদের ১ম অধিবেশন সময়কালে ভবিষ্যত সংবিধান প্রশ্নে বোঝাপড়া উপনীত হওয়া উচিত। ইয়াহিয়া নিজের গীত নিয়ে পেয়ে আরও বলেন '...প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে যথেষ্ট সময়ও দিয়েছি'। এরপর সংক্ষেপে পরিস্থিতি ব্যাখ্যায় ইয়াহিয়া স্বরূপে আবির্ভূত হন '... পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল, পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল ০৩রা মার্চ, ১৯৭১ এ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ না দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। আরও ভারত যে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তা গোটা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এ জন্য আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখ স্থগিত করেছি' (Bangladesh Documents, Vol-1, 1999:189)। ইয়াহিয়া আরও বলেন 'আমি বারবার বলেছি সংবিধান সাধারণ কোন আইনগত বিধান নয় বরং একসঙ্গে বসবাস করার চুক্তি। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত মুলত...সংবিধান প্রশ্নে ঐক্যমত্যে পৌঁছানোর জন্য রাজনৈতিক নেতাদের সামনে আরও সময় দেওয়ার জন্য।' সবশেষে ইয়াহিয়া 'রাজনৈতিক নেতা ও দেশবাসীর প্রতি' জাতির জনকের শিক্ষা-'বিশ্বাস' 'একতা' এবং 'শৃঙ্খলা' রক্ষার জন্য আবেদন করে (Bangladesh Documents, Vol-1, 1999:189)।

ইয়াহিয়া খানের বিবৃতিতে অন্ততঃ কয়েকটি দুর্বলতা প্রকট, **প্রথমতঃ** ইয়াহিয়া 'পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের তথাকথিত হুমকিকে বিবেচনায় নিয়েছেন কিন্তু পাকিস্তান পিপলস পার্টি নির্বাচনে জয়ী রাজনৈতিক দল নয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানে দু'টি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ পাওয়া রাজনৈতিক দল। এক্ষেত্রে নির্বাচনে জয়ী প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের অসন্তোষকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। **দ্বিতীয়তঃ** সংবিধান গঠন প্রশ্নে ইয়াহিয়া বা অন্যান্যদের উদ্বিগ্নতা যুক্তির ধোপে টেকে না, কারণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এটি সম্পূর্ণ জাতীয় পরিষদের এখতিয়ার ভূক্ত। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিগণ শাসন তন্ত্র প্রণয়নের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা

পাওয়ায় ইয়াহিয়া খান ভূট্টো এবং অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানিদের সংবিধান প্রশ্নে আওয়ামী লীগকে বিশ্বাস না করতে পারার প্রেক্ষাপটেই সমস্যার সূচনা। আসলে ক্ষমতার বলয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা ইয়াহিয়া এবং পশ্চিম পাকিস্তানে দু'টি প্রদেশে জয়ী ভূট্টো নিজেদের পাকিস্তানের সম্ভাব্য ত্রাণকর্তা ভাবার প্রেক্ষাপটে রয়েছে ঔপনিবেশিক মানসিকতা। তাঁরা দু'জন ছাড়া পাকিস্তানের অখন্ডতার ব্যাপারে আর কারও বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের কাউকে বিশ্বাস করা যায় না– এমন ভাবনা প্রবল। তৃতীয়ত : ২৮ ফেব্রুয়ারি গভর্ণর এসএম আহসান তার বার্তায় পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি জানিয়ে জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের নতুন তারিখের ব্যাপারে যে আবেদন করেছিলেন সেটিতে আমলে নিতে দেখা যায়নি বরং শুধুমাত্র জাতীয় পরিষদের পূর্ব নির্ধারিত ০৩ মার্চ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। (গভর্ণর আহসানকে ০১ মার্চ অব্যাহতি দেয়া হয়।) চতুর্থত : নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের বিশ্বাস, একতা এবং শৃঙ্খলা ভয়াবহ রকম টলে গিয়েছিল বলেই বক্তব্যের শেষে জাতির জনকের নামে এমন আবেদন।

রেডিও পাকিস্তানের সম্প্রচারে ইয়াহিয়া খানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা প্রচার চলছিলো, তখন হোটেল পূর্বানিতে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের ৩০ সদস্যের একটি কমিটি জাতীয় পরিষদের খসড়া শাসনতন্ত্র বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন (ঘোষ, শ্যামলী, ২০০৭:২৪৪-২৪৫)। প্রকৃতপক্ষে ঢাকা নগর ইয়াহিয়ার ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া প্রকাশের পরই কেবল উক্ত সংসদীয় কমিটি এ ঘটনার কথা অবহিত হন (ঘোষ, শ্যামলী, ২০০৭:২৪৫)। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা সামগ্রিক পরিস্থিতি আমূলে বদলে দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে সম্পূর্ণরূপে। সরকারি অফিস, আদালত, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্প-স্থাপনা প্রভৃতি থেকে বিক্ষুব্ধ জনতা রাস্তায় নেমে আসে। জনগণের স্বতস্ফুর্ত এবং তীব্র প্রতিক্রিয়া পূর্ব এবং পশ্চিমের রাজনৈতিক নেতাদের বিস্মিত করে। অপর্যাপ্ত পূর্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিক্ষুব্ধ জনতাকে মোকাবেলার সামর্থ্য ছিলনা (Sisson and Rose, 1990:91)।

আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দল হিসেবে এটাকে পুঁজি করতে যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়। ইয়াহিয়ার বিবৃতির প্রতিক্রিয়াতে শেখ মুজিবুর রহমান অসামান্য দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। যার মাধ্যমেই মুলতঃ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের উষাপর্বের সূচনা কাল হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। আওয়ামী লীগের সংসদীয় কমিটির বৈঠক শেষে ০১ লা মার্চ শেখ মুজিব অপেক্ষমান সাংবাদিকদের কাছে প্রতিক্রিয়ায় বলেন '... ৭০ মিলিয়ন বাঙ্গালির মুক্তির জন্য তিনি সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত।' বিগত ২৩ বছরের 'ঔপনিবেশিক শাসন' অবসানের জন্য সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। শেখ আরও ঘোষণা করেন '... সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের মতামত ছাড়া অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেয়া হবে না (Bangladesh Documents, Vol-1, 1999:189)।

শেখ মুজিব ঐদিন ০৬ দিনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ০২ রা মার্চ ঢাকায়, ০৩ রা মার্চ সারাদেশে হরতাল ঢাকা হয় এবং ০৭ মার্চ রমনা রেসকোর্সের ময়দানে সমাবেশের ঘোষণা দিয়ে বলা হয়, ঐদিন আওয়ামী লাগের প্রধান পরবর্তী চূড়ান্ত কর্মসূচী ঘোষণা করবেন। শেখ মুজিব আরও সতর্ক করে বলেন, 'ষড়যন্ত্রকারীদের যদি সম্বিত ফিরে না আসে তাহলে আপনারা দেখবেন ইতিহাস তৈরী হবে (Bangladesh Documents, Vol-1, 1999:190)। তিনি দূরদর্শিতা দেখিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত অবাঙালি জনগনকে 'এ মাটির সন্তান' এ মাটিকে তাদের মাটি মনে করার জন্য এবং তাদেরকে, এ দেশের মানুষের সঙ্গে যোগদানের ব্যাপারে আহবান জানান। তিনি প্রেসকে আরও অবহিত করেন, আওয়ামী লীগ সংসদীয় কমিটি জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য শেষ পর্যন্ত 'যে কোন ত্যাগ' স্বীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করছে। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে আরও বলেন 'বাংলাদেশের জনগণের মুক্তির জন্য যেকোন ত্যাগ অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয়।' তিনি প্রেসকে আরও অবহিত করেন যে, তিনি পরিস্থিতির সর্বশেষ তথ্য নিয়ে মাওলানা ভাসানী, নূরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, প্রফেসর

মুজাফফর আহমেদ এবং অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ে আলোচনা করবেন। সবশেষে শেখ মুজিব বলেন '...জনগণ সুস্পষ্টভাবে ছয় দফাতে রায় দিয়েছে এবং আমরা ছয় দফা এবং এগারো দফার উপর ভিত্তি করে সংবিধান প্রণয়ন করব (Bangladesh Documents, Vol-1, 1999:191)।

আওয়ামী লীগের কর্মসূচী জনগণের মাঝে স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যাপক সাড়া ফেলে। ০২ রা মার্চের ঢাকার হরতাল প্রদেশব্যাপী হরতালে পরিণত হয়। ০৩ রা মার্চের হরতালও প্রদেশব্যাপী অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে। সব সরকারী এবং বানিজ্যিক কর্মকান্ড সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বন্ধ থাকে। হরতালের প্রভাবে সব সরকারী অফিস, কোর্ট, আধা সরকারী এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বিমান, সড়ক ও রেল যোগযোগ, কলকারখানা এবং সকল অন্যান্য শিল্প ও বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান অকেজো হয়ে পড়ে (Sisson and Rose, 1990:92)। হরতাল প্রত্যাশার চাইতেও সফল হয়। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধকালীন সময়ের মতো পূর্ব পাকিস্তান অবশিষ্ট বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন পূর্ব পাকিস্তানে মূলত দু'ধরণের কর্তৃত্ব বলয় বিদ্যমান ছিল, একদিকে ছিল নতুন স্বশাসিত বাংলাদেশ যার সর্বময় কর্তৃত্বে ছিল আওয়ামী লীগ, অন্য দিকে ক্যান্টনমেন্ট কেন্দ্রিক সামরিক বাহিনী (আহমদ, মওদুদ, ২০০৩:১৮৫)।

পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সামনে রাজনৈতিক সংকটকে রাজনৈতিক ভাবে মোকাবেলার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের অভাবে পরিস্থিতি আরও সংকটময় হয়ে ওঠে। ইয়াহিয়া রাজনৈতিক সংকট মোকাবেলা করার জন্য সামরিক সমাধান পূর্ব থেকেই নিয়ে রাখছিলেন তার তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। লে. জেনারেল গুলহাসান জানাচ্ছেন '... প্রেরিত সৈন্যদের প্রথম ব্যাচ ঢাকায় পৌছাতে শুরু করে ২৭ ফেব্রুয়ারী বিকেলে। ০২ রা মার্চ নাগাদ দুই ব্যাটালিয়নের একটি বিগ্রেড পাঠানো সম্পন্ন হয় (খান, গুল হাসান, ২০০৯:২৩)।'

ফেব্রুয়ারি মাসে সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার ইন চীফ জেনারেল আব্দুল হামিদ খান, জেনারেল ইয়াকুবকে জানান দুই ডিভিশন সৈন্য করাচী বন্দরে মজুদ আছে। 'পরিকল্পনা অনুযায়ী সামরিক সমাধানের জন্য' প্রয়োজন হয় (Sisson and Rose, 1990:95)। তাহলে দু'জন গুরুত্বপূর্ণ সেনানায়কের বিবরণে লক্ষ্য করা যাচ্ছে ইয়াহিয়া পূর্ব থেকে সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু সবকিছু ঠিকঠাক মতো চললেও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া সবকিছু এলোমেলো করে দেয়। জেনারেল ইয়াকুব ০৩রা মার্চ সকালে ইয়াহিয়াকে পরিস্থিতি অবহিত করে বলেন '... পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে মিনিটে মিনিটে। ইয়াহিয়ার ঢাকায় আসা প্রয়োজন।' রাত ১০.০০ টায় জেনারেল পীরজাদা ইয়াকুবকে টেলিফোন করে জানান 'রাষ্ট্রপতি আসছেন না'। পরে রাত্রে জেনারেল ইয়াকুব পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এবং সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে পদত্যাগ করেন। তাঁর পদত্যাগে কারফিউ উঠে যায় এবং অধিকাংশ এলাকা থেকে সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরে আসে (Sisson and Rose, 1990:96)।

০২রা মার্চ পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদ শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্যে প্রচারিত এক খোলা চিঠিতে 'সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন দেশ' প্রতিষ্ঠার আহবান জানায়। উক্ত প্রচারপত্রে 'পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন, মুক্ত ও স্বাধীন' করা এবং 'পাকিস্তানের অবাঙালী শাসকগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান করে স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র কায়েমের জন্য' আহবান জানানো হয় (রহমান, হাসান হাফিজুর, ১৯৮২:৬৬৭)। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ৩রা মার্চ ১৯৭১-এ পল্টন ময়দানে এক জনসভায় 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচী' শীর্ষক এক নং ইশতেহার প্রচার করে। উক্ত ইশতেহারে 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ' এর ঘোষণা, 'বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য কর্মপন্থা' এবং 'স্বাধীনতা আন্দোলনের ০৮টি ধারার' বিবরণী দেয়া হয় (রহমান, হাসান হাফিজুর, ১৯৮২:৬৬৯-

৭০)। ইশতেহারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক' ঘোষণা করে নিম্নলিখিত জয়ধ্বনি করার ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়া হয়:

> 'স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ'– দীর্ঘজীবী হউক; স্বাধীন কর স্বাধীন কর বাংলাদেশ স্বাধীন কর; স্বাধীন বাংলার মহান নেতা- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব; গ্রামে গ্রামে দূর্গ গড়- মুক্তিবাহিনী গঠন কর; বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর; মুক্তি যদি পেতে চাও- বাঙালীরা এক হও (রহমান, হাসান হাফিজুর, ১৯৮২:৬৭০)।'

২রা মার্চের হরতালের সময় পুলিশের গুলিতে দুইজন নিহত এবং কয়েকজন গুরুতর আহত হলে শেখ মুজিব ঐদিন সন্ধ্যায় প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিন্দা প্রকাশ করে বলেন '... বাঙালিদের আর দমিয়ে রাখা যাবেনা, বাজার অথবা উপনিবেশ হিসেবে শোষনকে তারা আর বেশিদিন মেনে নেবে না (Bangladesh Documents, Vol-1, 1999:191)।' এরপর ০৭ই মার্চ পর্যন্ত নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করেন। কর্মসূচীটি 'a' থেকে 'e' পর্যন্ত মোট পাঁচটি ধারায় বিবৃত ছিল, যার মধ্যে ছিল '... ৩রা মার্চ থেকে ০৬ই মার্চ (১৯৭১) পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬.০০ থেকে বেলা ২.০০ টা পর্যন্ত প্রদেশব্যাপী হরতাল। ০৩রা মার্চ জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন। ০৭ই মার্চ বেলা ০২টায় রেসকোর্স ময়দানে জনসভা (Bangladesh Documents, Vol-1, 1999:192-193)।'

মওদুদ আহমদ (২০০৩) জানাচ্ছেন, '... পাকিস্তানের জাতীয় বেসামরিক বিমান সংস্থা পিআইএকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পুরো নবম ও ১৬ ডিভিশন ও দু'টি বিগ্রেড ও পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় নিয়ে আসার জন্য নিয়োজিত করা হয়। ০২রা মার্চ থেকে শুরু করে করাচী-ঢাকা ফ্লাইটে, সেনাবাহিনী ও বাছাইকৃত দেশত্যাগীদের আনা নেয়ার কারণে অন্যান্য বেসামরিক যাত্রীদের জন্য বন্ধ করা দেয়া হয়। একই সময়ে লন্ডনের ফ্লাইট সপ্তাহে তিন থেকে চারটি কমিয়ে করাচী-ঢাকা ফ্লাইট দৈনিক ১১ থেকে ১২, কোনো কোনো দিন ১৫টি পর্যন্ত বাড়ানো হয়। এ সময় পিআইএ নিরাপত্তা জনিত কারণে প্রায় ১৪০০ বাঙালি কর্মচারীকে বদলী করা এবং বেশির ভাগ বাঙালি পাইলটকে বসিয়ে রাখে (আহমদ, মওদুদ, ২০০৩:১৮৫)।

আওয়ামী লীগ আনুষ্ঠানিকভাবে 'অহিংস ও অসহযোগ' আন্দোলনের কথা ব্যক্ত করলেও জনগণ ও আইন প্রয়োগকারী বাহিনীগুলোর সঙ্গে সংঘর্ষ মার্চের ১ম থেকেই নৈমিত্তিক ব্যাপারে হয়ে দাঁড়ায়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আহূত বিরাট জনসভায় পাকিস্তানি পতাকা পুড়িয়ে ফেলে বাংলাদেশের নামে এক পতাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তোলন করা হয়। পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা যখন পোড়ানো হচ্ছিল, সভার জনতা তখন ঐ পতাকার একটি বিকল্প দাবি করে। হাতের কাছে তখন ছাত্রলীগের জঙ্গি বাহিনীর কাছে একটা পতাকা পাওয়া যায়, যে পতাকায় ছিল লাল বৃত্তের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্রের সোনালী রঙের রূপরেখা যার পটভূমি হিসেবে সবুজের জমিনে দেখানো হয়েছে পূর্ণ উদিত সূর্য (ঘোষ, শ্যমলী, ২০০৭:২৪৬)।

০৩রা মার্চ ১৯৭১ শেখ মুজিব ছাত্রলীগ আয়োজিত বিশাল জনসভায় সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানান। ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত সকল ধরণের ট্যাক্স প্রদান বন্ধ রাখার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান (রহমান, হাসান হাফিজুর, ১৯৮২:৬৭৪)। এমনি অবস্থায় প্রেসিডেন্ট শাসনতান্ত্রিক সংকট সমাধান করার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ০৩ রা মার্চ জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারী গ্রুপের ১২জন নির্বাচিত সদস্যকে পরবর্তী ১০ মার্চ ঢাকায় মিলিত হবার আহ্বান জানান (রহমান, মাহবুবর, ২০০৬:২৩০)। আওয়ামী লীগ ঐ ধরণের বৈঠকে বসতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে (রহমান, মাহবুবর, ২০০৬:২৩০)। শেখ মুজিব ছাড়াও নূরুল আমিনসহ জামায়াতে ইসলামী, জমিয়াতে উলেমায়ে ইসলাম (হাজারভী গ্রুপ) কনভেনশনে মুসলিম লীগ ও অন্যান্য অনেকগুলো দলের নেতৃবর্গ বৈঠকে যোগদানে অস্বীকার করায় প্রস্তাবিত এই বৈঠক বাতিল করে দেয়া হয় (আহমদ, মওদুদ, ২০০৩:১৮৫)।

আন্দোলনের পুরোভাগে থাকা ছাত্র সমাজ স্বাধীনতার স্বপক্ষে জনমত গঠনের জন্য প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দেশব্যাপী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে। শেখ মুজিব সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে মাওলানা ভাসানী, মোজাফফর আহমেদ, নূরুল আমিন এবং আতাউর রহমান খানের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেন। তাঁরা সকলেই বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামে মুজিবকে তাদের পূর্ণ সমর্থন দেন। ছাত্র, কারখানা শ্রমিক, সরকারি কর্মচারী এবং বুদ্ধিজীবী মহলসহ সকল শ্রেণীর জনগণ স্বাধীনতার অনুকূলে প্রস্তাব নিয়ে মুজিবের কাছে আসেন (আহমদ, মওদুদ, ২০০৩:১৮৫)। সরকারি অফিস, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ, মিল কারখানা, ব্যক্তিগত শিল্প কারখানা ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি নির্দেশের চেয়ে মুজিবের নির্দেশে কাজ করতে থাকেন।

এরকম পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ০৬ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। তাঁর বক্তব্যের শেষাংশ এরকম '... পরিশেষে, আমি একথা পরিষ্কার বলে দিতে চাই যে, পরে কী ঘটবে তাকে কিছু যায় আসে না। কিন্তু পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনী যতদিন আমার কমান্ডে আছে এবং যতদিন আমি রাষ্ট্রপ্রধান আছি ততদিন আমি পাকিস্তানের পূর্ণ সংহতি বজায় রাখব। এ ব্যাপারে কেউ যেন কোনো সন্দেহ কিংবা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করেন। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মানুষের এদেশ রক্ষার দায়িত্ব আমার রয়েছে। দেশবাসী আমার কাছ থেকে তা আশা করে এবং আমি তাদের নিরাশ করব না (Sisson and Rose, 1990:102)।' নিরপরাধ লক্ষ পাকিস্তানির মাতৃভূমি ধ্বংসের পায়তারা আমি বরদাসত করব না।' পাকিস্তানের অখণ্ডতা, সংহতি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কর্তব্য, যে কর্তব্যে তারা কখনও ব্যর্থ হয়নি (Bangladesh Documents, Vol-1, 1999:192-216)।

ইয়াহিয়া খানের ভাষণটি মরিয়া সাবধান বাণীর মতো রাষ্ট্রনায়োকোচিত নয়। আসলে মার্চের প্রথম থেকে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত 'অহিংস অসহযোগ আন্দোলন' পাকিস্তানের ভিত বাড়িয়ে দিয়েছিল অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য। একটি চমৎকার ঐক্যের নিদর্শন স্বরূপ সব সরকারি কর্মচারী (হাইকোর্টের বিচারপতিসহ) মুজিবের ইচ্ছানুযায়ী দীর্ঘ সময় কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকতে থাকে। এক্ষেত্রে মুজিবের বাসভবন বংলাদেশের সচিবালয়ে পরিণত হয় (Talukder, Moniruzzaman, 1980: 79)।

রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা কেন্দ্রের নামকরণ করা হয় 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র' বাংলাদেশের বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতির উপর সংবাদ বুলেটিন প্রচার করতে থাকে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' বেতার থেকে বারবার প্রচার করতে থাকে। বেতারে আরও দেশাত্মবোধক এবং বিপ্লবী বাংলা গান প্রচারিত হতে থাকে (Talukder, Moniruzzaman, 1980: 79)।

এ রকম পরিস্থিতিতে ৭ই মার্চ ১৯৭১ সালে শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ঐতিহাসিক এই ভাষণের প্রাক্কালে উত্তাল প্রদেশব্যাপী জনগণের প্রত্যাশা ছিল ঐদিন তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিবেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অতুলনীয় দুরদর্শিতা দিয়ে বুঝেছিলেন– সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার চাইতে পরোক্ষ ইঙ্গিত দিয়ে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা সমীচীন হবে। একজন নিয়মতান্ত্রিক ও উদারপন্থী রাজনীতিবিদ হিসেবে দু'টি বিষয় অর্জনের চেষ্টা চালান **প্রথমতঃ** 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে একদিকে যেমন জনগণকে শান্ত রাখেন অন্যদিকে কৌশলে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করেন। **দ্বিতীয়তঃ** পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার কথা বলেও আলোচনার পথ খোলা রাখতে চারটি প্রধান দাবী ঘোষণা করেন : ক) সামরিক আইন প্রত্যাহার খ) সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া গ) গণহত্যার তদন্ত করা ঘ) নির্বাচিত

প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। দাবীগুলো জানানোর পর ঘোষণা করেন, '...তারপর বিবেচনা করে দেখব, আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারব কি পারব না (রহমান, হাসান হাফিজুর, ১৯৮২:৭০৪)।' শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে দীর্ঘ দিনের বঞ্চনার কথা বলে সাম্প্রতিক সময়ে এসেমব্লি বন্ধের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, '১৯৭০ সাধারণ নির্বাচনে জয়ী পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ করেছিলাম ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দিতে। তিনি আমার কথা না রেখে ভুট্টো সাহেবের কথা মত ৩ মার্চ তারিখ নির্ধারণ করলেন। 'আমি বললাম ঠিক আছে।' এরপরই ভুট্টো বললেন 'পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বার যদি আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি।' তিনি বললেন যে যে যাবে তাদের মেরে ফেলে দেওয়া হবে, যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে 'পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত জোর করে বন্ধ করা হবে (রহমান, হাসান হাফিজুর, ১৯৮২:৭০৩)। ভুট্টোর হুমকিতে ১ তারিখ এসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হয়। শেখ মুজিব রাষ্ট্র পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গগুলোকে নিজ কর্তৃত্ববলয়ে ঘোষণা করেন '... কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।' ... রিক্সা, গরুরগাড়ি, রেল চলবে-শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্ণমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না। '২৮ তারিখ কর্মচারীরা বেতন নিয়ে আসবেন।' এরপর তাঁর সুবিদিত ঘোষণা '... এরপর যদি একটা গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়-তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে ... আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে (রহমান, হাসান হাফিজুর, ১৯৮২:৭০৪)।' ভাষণের শেষ পর্যায়ে রাষ্ট্রনায়কের মত ঘোষণা '... সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন ওয়াপদা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হল– কেউ দেবে না।... কর্মচারীরা, রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবে না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে টেলিভিশনে যাবেন না। ০২ ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে।... টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে। ... রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ্ (রহমান, হাসান হাফিজুর, ১৯৮২:৭০৫)।'

এই ভাষণের পর উত্তাল গণদাবীর সামনে শেখ মুজিবের ভূমিকা হয়ে পড়ে আরো শক্তিশালী। ভুট্টোর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জন, সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা না করে ইয়াহিয়া কর্তৃক অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত, পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র জনগণকে নির্বিচারে হত্যা, ৬ই মার্চ ইয়াহিয়ার বিবৃতি প্রভৃতি বিষয়গুলোর আলোকে সমঝোতায় পৌঁছানো ছিল প্রায় অসম্ভব (আহমদ, মওদুদ, (২০০৩:১৮৮)। গোটা পরিস্থিতিকে অসম্ভব করেছিল মূলতঃ জনগণ, মুজিবের ভাষণের পর পূর্ব পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভবনের পানির লাইন কেটে দেয়া হয় এবং ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খানের ঢাকায় আসার পূর্ব পর্যন্ত সেটা বিচ্ছিন্ন ছিল (Sisson and Rose, 1990:102)। এ ধরণের চরম অস্থির রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে তাল বজায় রেখে মুজিব সর্বস্তরের জনগণের পূর্ণ সহযোগিতায় অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। প্রচার মাধ্যমে প্রতিদিন বিভিন্ন ধরণের আদেশ ও নির্দেশ দেয়া হতে থাকে এবং জনগণ সেগুলো পুরোপুরিভাবে মেনে চলতে থাকে। এই অসহযোগ আন্দোলনের অসাধারণ উদাহরণ হল-৮ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি পূর্ব পাকিস্তানে নব-নিযুক্ত গভর্ণর জেনারেল টিক্কা খানকে শপথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে (Sisson and Rose, 1990:102)। এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তান পরিচালিত হতে থাকে শেখ মুজিবের নির্দেশে। ৭ই মার্চ শেখ মুজিব সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচী ঘোষণা করে বলেন '... সামরিক আইন দ্রুত প্রত্যাহার, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত অহিংস এবং অসহযোগ আন্দোলন চলতেই থাকবে (রহমান, হাসান হাফিজুর, ১৯৮২:৭০৬)।' ঐদিন ঘোষিত দশ দফা কার্যক্রম ছিল মুলত ৭ই

মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ভাষণে উচ্চারিত নির্দেশাবলীর গোছালো চিত্র (রহমান, হাসান হাফিজুর, ১৯৮২:৭০৬)।

ভুট্টোর প্রভাবে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করণের ফলে পূর্ব ও পশ্চিমের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমান অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলেরও সমর্থন লাভ করেন। মার্চের প্রথম সপ্তাহেই পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় দু'জন নেতার একজন নূরুল আমিন রাষ্ট্রপতি আহুত সর্বদলীয় সম্মেলনে যোগ দিতে অস্বীকার করেন (Sisson and Rose, 1990:103)। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও সম্মিলিত প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় মাওলানা মুফতি মেহমুদ, জামায়াত-উল-উলেমা-ই-ইসলাম এর সাধারণ সম্পাদকের উদ্যোগে ১৩ই মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মিটিং-এ কাইউম মুসলিম লীগ বাদে অন্যান্য সকল দলের সমর্থন অর্জনকারী পশ্চিম পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে সংখ্যালঘু গ্রুপসমূহ শেখ মুজিবুর রহমান পেশকৃত চারটি দাবীর ব্যাপারে একাত্নতা জানায় (Sisson and Rose, 1990:103)। উক্ত গ্রুপটি প্রকাশ্যে শেখ মুজিবকে স্পষ্ট নিশ্চয়তা দিয়ে ঘোষণা করছে যে, সংবিধান পত্রে জাতীয় পরিষদে পক্ষপাতশুন্য আলোচনায় এবং সাংবিধানিক সংকট সমাধানে পরিষদে তাদের অবস্থান সংখ্যাগরিষ্ট দলের অনুকূলে থাকবে। ... এক্ষেত্রে যদি ষড়যন্ত্র হয় তাহলে এক্ষেত্রে তাদের অবস্থান আওয়ামী লীগের পক্ষে থাকবে (Sisson and Rose, 1990:104)। এরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান পিপলস পার্টি ক্রমেই নিঃসঙ্গ হওয়ার প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের অবস্থান রাজনৈতিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বাধীনতার জন্য উদগ্র বাসনা দিনে দিনে আরও বাড়তে থাকে। শেখ মুজিবুর রহমান বা আওয়ামী লীগ প্রকাশ্যে 'স্বাধীনতা' শব্দটি না বললেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ জনগণের বাসনাকে ভাষা দিয়ে গোটা আন্দোলনকে একটি নিশ্চিত পরিণতির দিকেই নিচ্ছিলেন।

৮ই মার্চ ১৯৭১-এ ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের 'আপোষের চোরাচালিতে বাংলার এ স্বাধীনতার উদিত সূর্য যেন মেঘাচ্ছন্ন না হয়,' শীর্ষক শিরোনামের প্রচারপত্রের শুরু হয়- 'সাড়ে সাত কোটি বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে।' উক্ত প্রচার পত্রে 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' গঠনের জন্য 'Bengal Liberation Front' গঠনের আহ্বান জানিয়ে 'জয় স্বাধীন বাংলা' বলে প্রচার পত্রের সমাপ্তি টানা হয় (রহমান, হাসান হাফিজুর, ১৯৮২:৭০৯)। একই তারিখে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ শুধুমাত্র 'ছাত্রলীগ' নাম ধারণ করে 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (রহমান, হাসান হাফিজুর, ১৯৮২:৭১১)। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি ০৯ মার্চ ১৯৭১-এ 'স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে নির্দেশনা দেয় যে ... পাড়ায়, মহল্লায়, গ্রামে কলকারখানায় সর্বত্র 'স্থানীয় সংগ্রাম কমিটি' ও 'গণবাহিনী' গড়ে তোলার (রহমান, হাসান হাফিজুর, ১৯৮২:৭১৪)। পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত জনসাধারণের প্রতি মাওলানা ভাসানী ০৯ মার্চের প্রচারপত্রে 'পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান (রহমান, হাসান হাফিজুর, ১৯৮২:৭১৫)। ভাসানী ১০ মার্চ '৭১-এ পল্টনের বিরাট জনসভায় ঘোষণা করেন, '... সাত কোটি বাঙালির মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। '... এ ব্যাপারে কোন আপোষও সম্ভব নয়।' ভাসানী আলাপ আলোচনা বা আপোষ রফার ব্যাপারে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন '... শেখ মুজিব বা মাওলানা ভাসানী বা যে কোন নেতা যদি এ ব্যাপারে আপোষ করতে যায় জনতা তাকে আস্ত রাখবে না।' শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি তিনি 'পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেয়ে বাংলার সংগ্রামী বীর' হওয়ার আহ্বান জানান (রহমান, হাসান হাফিজুর, ১৯৮২:৭২১)। তাজউদ্দীন আহমদ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিরতি দেন ১১ মার্চ ১৯৭১ (রহমান, হাসান হাফিজুর, ১৯৮২:৭৩১)। বাংলাদেশের নামে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সচল রাখার ব্যাপারে' শীর্ষক বিবৃতিতে তাজউদ্দীন আহমেদ ব্যাংক পরিচালনা এবং কার্য পরিচালনার ব্যাপারে দু'টো প্রধান ধারা এবং

অনেকগুলো উপধারার মাধ্যমে গোটা অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার চিত্র এমনভাবে তুলে ধরেন যে মনে হবে একজন অর্থমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থাকে পরিচালনা করছেন। একই তারিখে ছাত্র ইউনিয়ন, 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের সংগ্রাম' আহ্বান করে। উক্ত প্রচারপত্রে সর্বত্র 'সংগ্রাম কমিটি' ও 'গণবাহিনী' গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। পূর্ব বাংলার 'ঘরে ঘরে দূর্গ গঠন' করার আহ্বান জানানো হয় (রহমান, হাসান হাফিজুর, ১৯৮২:৭৩৫)।

এ ধরণের সর্বস্তরের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে 'অহিংস' অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমানের কর্তৃত্ব ও প্রভাব অপ্রতিহত গতিতে নিরঙ্কুশ আধিপত্যের দিকেই যাচ্ছিল। ১৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখে আন্দোলনের নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। যেখানে উল্লেখ করা হয়- '১৫ই মার্চ থেকে যে নয়া কর্মসূচী শুরু হবে নির্দেশাবলীর আকারে প্রতিপালিত হবে। সরকারী সংস্থাসমূহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, মিল, কলকারখানা, ব্যাংক, ইত্যাদির দায়িত্ব ও আচরণবিধি নির্দেশনা অনুসারে পরিচালিত হতে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য কর আদায় স্থগিত ও ব্যাংকিং চ্যানেলে মূলধন পাচার বন্ধ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। সাইক্লোন কবলিত এলাকায় ত্রাণ সাহায্য প্রদান থেকে শুরু করে ইটাখোলায় কয়লা সরবরাহ, নলকূপ স্থাপন, খাদ্যশস্য পরিবহন ও গুদামজাতকরণ, কৃষি ঋণ, ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ, রাস্তাঘাট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কর্মকান্ড নির্দেশনার অধীনে পরিচালিত হতে থাকে। সর্বমোট ৩৫টি নির্দেশ জারি করা হয় (রহমান, হাসান হাফিজুর, ১৯৮২:৭৪০-৭৪৬)।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা থেকে সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকট কিভাবে গোটা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় সিশন এ্যান্ড রোজ (১৯৯০) কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ইঙ্গিত করেছেন–

> **প্রথমত :** ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান সরকার আরো বেশী সামরিক এবং বেসামরিক গোয়েন্দাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর এডমিরাল আহসানের উপর আস্থা হারিয়ে অন্য সূত্র অর্থাৎ সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দাদের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে কেন্দ্রীয় প্রশাসন।
>
> **দ্বিতীয়ত :** জেনারেল আকবর খান ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতি বৈরী মনোভাবাপন্ন এবং গোলাম উমরও পশ্চিমের উপর দূর্বল ছিলেন–এ দু'জনের সরবরাহকৃত রাজনৈতিক তথ্যদি কোনরূপ যাচাই, বাছাই অথবা মূল্যায়ন ছাড়াই সরাসরি ইয়াহিয়ার নিকট উপস্থাপিত হত।
>
> **তৃতীয়ত :** সরকারী গোয়েন্দাদের আওয়ামী লীগের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত দূর্বল, তারা প্রধানত নির্ভর করত অবাঙালিদের ওপর।
>
> **চতুর্থত :** ইয়াহিয়া উপদেষ্টা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বসতেন অস্থায়ী ভিত্তিতে কিন্তু ভূট্টোই একমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তি যার সঙ্গে নিয়মিত বসতেন।
>
> **পঞ্চমত :** ভূট্টো এবং সেনাবাহিনী সংশ্লিষ্ট গ্রুপগুলোর জন্য তাৎক্ষণিক এবং অব্যাহতভাবে ইয়াহিয়া দুয়ার খোলা_ছিল, কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামোর দূর্বলতা এবং স্বার্থন্বষী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের একচেটিয়া আধিপত্য-এটা রাষ্ট্রপতির জন্য পরিস্থিতি এতটাই জটিল করে তোলে যে তিনি কোন তথ্যের সঠিকতা নিরাপণের সুযোগ পেতেন না। অস্থায়ী পদ্ধতি এবং সীমিত প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ রাষ্ট্রপতির জন্য বিকল্প ব্যবস্থাও কঠিন করে তোলে (Sisson and Rose, 1990:107-110)।

মধ্য মার্চে এসে পশ্চিম পাকিস্তান ছোট দলগুলোর আওয়ামী লীগের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করায় এবং পূর্ব পাকিস্তানে বিস্ফোরণ মুখ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভূট্টো এবং তাঁর পিপলস পার্টিকে নিঃসঙ্গ করে দেয়। অপরদিকে আওয়ামী লীগে আরও বেশী শক্তপোক্ত অবস্থান পেয়ে যায়। ভূট্টো কার্যকরভাবে

আলোচনায় বসতে রাজী না হলেও সরকার আলোচনার ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়। ভূট্টো এবং সরকারের অবস্থান দৃশ্যত আলাদা হলেও মধ্য মার্চে ভূট্টো তখনও ভেটো পাওয়ারের অধিকারী কারণ স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন তাঁর (ভূট্টোর) সম্মতি ছাড়া কোন চুক্তি হবে না (Sisson and Rose, 1990:110)।'

## তিন

মার্চের শুরুতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে স্বতঃস্ফূর্ত যে গণজাগরণ সৃষ্টি হয় তার নিউক্লিয়াস ছিলেন শেখ মুজিব, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে ইয়াহিয়া খান ও তার সহযোগী ভূট্টো। যদিও যুক্তি বলে নির্বাচনে বিজয়ী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকার তবুও ঔপনিবেশিক মানসিকতায় প্রতিপালিত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আপন কর্তৃত্বের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তির মানসে 'ভূট্টো' নামক চরিত্রকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে সামনে আনায় পরিস্থিতি নাজুক হয়ে যায়। এরকম নাজুক পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া খানের সামনে দুটো পথ খোলা ছিল– প্রথমতঃ বাংলাদেশের সাথে কনফেডারেশন গঠন, দ্বিতীয়তঃ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত একটি ব্যাপক গণহত্যার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার অসহযোগ আন্দোলন দমন (Talukder, Moniruzzaman, 1980:82)।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণার পর থেকে ১৫ই মার্চের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের উপর মুজিবের দৃঢ় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়; যার কারণে আমলাতন্ত্র ও ব্যবসা-বাণিজ্য একরকম স্থবির হয়ে পড়েছিল। ১৫ই মার্চ ৩৫টি নির্দেশনামার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রশাসনিক কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার যে ঘোষণা দেন, তাতে আন্দোলন আরেক ধাপ এগিয়ে যায়। তিনি এমন কিছু নির্দেশনা দেন, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের ওপর তাঁর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। মনে হচ্ছিল মুজিব স্বাধিনতার ঘোষণা না দিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে চাচ্ছিলেন। সামরিক সরকারের কর্তৃপক্ষ তখন পর্যন্ত কোন স্তরে হস্তক্ষেপ করেনি আর মুজিব একের পর এক সতর্ক পদক্ষেপ নিয়ে যাচ্ছিলেন (জন পি থর্প, ২০১৬:৭৪)।

রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ১৫ই মার্চ বিকেলে কয়েকজন জেনারেলসহ ইয়াহিয়া খান যখন ঢাকায় পৌঁছান, তখনকার ঢাকার চিত্রের বিবরণের মধ্যে সামগ্রিক পরিস্থিতির চিত্র পাওয়া যায়,

> 'বিমান বন্দরের সব প্রবেশ পথ বন্ধ। স্টিল হেলমেট প্রহরীরা টার্মিনাল ভবনের ছাঁদে দন্ডায়মান। বিমান বন্দরের একমাত্র প্রবেশ পথ পিএএফ-এ ভারী অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী দন্ডায়মান। একটি ইনফ্যান্টি ব্যাটালিয়ন (১৮ পাঞ্জাব) এক কোম্পানী সৈন্য মেশিনগানসহ ট্রাকে গেটের বাইরে রাষ্ট্রপতিকে শহরের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরী। সতর্কভাবে বাছাইকৃত মাত্র একশত কর্মকর্তা এয়ারপোর্টের ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছিল। ... সেখানে ছিল না কোন ফুলের তোড়া, বেসামরিক কর্মকর্তা, শহুরে অভিজাতদের সারি, সাংবাদিক এবং ক্যামেরার কোন ফোকাস। এমনকি অফিশিয়াল ফটোগ্রাফারও উপস্থিত ছিল না। ...' (Sisson and Rose, 1990:111)।

রাষ্ট্রপতির বাসভবনে ইয়াহিয়া পৌঁছানোর পরই প্রদেশের রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থান নিয়ে জেনারেল টিক্কা খান, গোলাম উমর, রাও ফরমান আলী খান, এ, ও মিঠা, এস. এম. জি পীরজাদা এবং এয়ার কমোডোর মাসুদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। উক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী একজন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সেটি হবে 'চূড়ান্ত পাগলামি।' জনগণকে শান্ত না করে এ ধরনের অভিযান আর্মি এবং পশ্চিমের মধ্যে গভীর এবং স্থায়ী বৈরিতা সৃষ্টি করতে পারে, যা নিরন্তর আলোচনাতেও দুরীভূত করা সম্ভব নয়, এটা নিছক নতুন সমস্যার জন্ম দেবে। রাও ফরমান আলী– উক্ত মতামতকে সমর্থন করে আরও যুক্তি দেন যে, সামরিক

পদক্ষেপ শুধুমাত্র রাজনৈতিক পরিস্থিতিকেই অভাবনীয় পর্যায়ে নিয়ে যাবে না বরং ইতিমধ্যে ভঙ্গুর অর্থনীতি এবং আঞ্চলিক বাণিজ্যকেই ধ্বংস করবে (Sisson and Rose, 1990:112)।

১৫ই মার্চ তারিখে প্রেসিডেন্ট ভবনের উক্ত আলোচনায় উপরোক্ত মতামত গুলোর ব্যাপারে ইয়াহিয়া খান নেতিবাচক মানসিকতা দেখাননি। এর কারণ সম্ভবত: তিনি জানতেন স্বয়ং জিন্নাহ পাকিস্তানে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতেন। আসলে ঐ সময়ে ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট এবং চীফ মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে মুজিবকে রাজি করিয়ে বাগে এনে একটি সমাধানের উপায় খুঁজছিলেন।

১৬ই মার্চ সকালে শেখ মুজিব সাদা রঙের প্রাইভেট কারে কালো পতাকা টাঙিয়ে রাষ্ট্রপতির বাসভবনে আলোচনার উদ্দেশ্যে পৌঁছান। শেখ মুজিব প্রথমেই ড্রয়িং রুমে আলোচনার বিরোধিতা করেন। আলাদাভাবে এবং নিরাপদে কথা বলার জন্য রাষ্ট্রপতির প্রধান বেডরুমকে বেছে নেওয়া হয়। এই আলোচনায় মুজিব ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে যে চারটি দাবী জানান সেই চারটি দাবী আলোচনার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি মতামত ব্যক্ত করে বলেন, আলোচনা হবে সরকার এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে। তিনি আরও প্রস্তাব করেন যে, শাসনতন্ত্র তৈরী প্রক্রিয়াটি অনেক বেশী সহজ মনে হবে যদি একটির পরিবর্তে পূর্ব ও পশ্চিমে জাতীয় পরিষদের দুটো স্বতন্ত্র অধিবেশন বসে। তিনি পরামর্শ দেন যে, প্রেসিডেন্ট অফিস অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের মতো কার্যকর থাকবে শুধুমাত্র শাসনতন্ত্র চূড়ান্ত করনের জন্য (Sisson and Rose, 1990:113)।

ইয়াহিয়া সামরিক শাসন শেষ করে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি পূর্ণব্যক্ত করে শেখ মুজিবের প্রস্তাবগুলো যথাযথ গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দেন (Sisson and Rose, 1990:113)। ১৭ই মার্চ পরবর্তী মিটিং-এ ইয়াহিয়া একটি বাদে চারটি দাবীর সবগুলোই মেনে নেন। চতুর্থ দাবী 'অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতেই ঢাকায় এসেছেন' বলে মতামত প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন– 'সামরিক আইন প্রত্যাহার করে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে পিপিপিসহ সব রাজনৈতিক দলের বিস্তারিত আলোচনা হওয়া উচিত। এসময় পরিপূর্ণ একটি শাসনতন্ত্র রচনার চাইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নিয়েই আলোচনা হয়। এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে মুজিব এবং ইয়াহিয়া নিম্নবর্ণিত ঐকমত্যে পৌঁছান:

১) সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং প্রেসিডেন্টের ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে একটি বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।

১) প্রদেশগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।

২) ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট হিসেবে থাকবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ তার হাতে থাকবে।

৩) যৌথ অধিবেশনে সংবিধান চূড়ান্ত করার আগে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের সদস্যদের পৃথক বৈঠক অনুষ্ঠান (আহমদ, মওদুদ, ২০০৩:১৯৪)।

শেষের প্রস্তাব উত্থাপন করেন ভূট্টো নিজে এবং পরে ইয়াহিয়া তা সমর্থন করেন। ১৭ই এপ্রিল তাজউদ্দীন তার বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে, ইয়াহিয়ার পরামর্শ ছিল ভূট্টোর সঙ্গে একমত হওয়ার চেষ্টা করা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থির করা, কারণ ০৬ দফা কর্মসূচী পরিপূর্ণভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিল না। এজন্য মুজিব ভূট্টোর সঙ্গে একমত হওয়ার স্বার্থে মেনে নেন (আহমদ, মওদুদ, ২০০৩:১৯৪)।

১৯শে মার্চ মুজিব ও ইয়াহিয়া আবার বৈঠকে বসেন। ইয়াহিয়া সামরিক আইন প্রত্যাহার করে একটি ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরে সম্মত হন। তারা এ ব্যাপারেও একমত হন যে ৬ দফা কর্মসূচী অনুসারে পূর্ব পাকিস্তানকে পর্যাপ্ত পরিমাণে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া হবে, মুজিব এবং

ইয়াহিয়ার মধ্যে চুক্তি অনুসারে ইয়াহিয়ার সাহায্যকারীরা এমন একটি খসড়া ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করলেন যেখানে ৭নং আইটেমে পূর্ব পাকিস্তানের আইন প্রণয়নগত ক্ষমতা '... ১৯৬২ সালের সংবিধানের তৃতীয় তফসীল অনুযায়ী আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইন সভার হাতে ন্যাস্ত থাকবে।' ওয়ার্কিং পেপারে এধরনের ধারা দেখে ২১শে মার্চ মুজিব ও তাজউদ্দিন ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করে তাদের হতাশা ব্যক্ত করলে ইয়াহিয়া তাদেরকে আশ্বস্ত করে জানান যে শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করার পূর্বে তাদের মধ্যকার সমঝোতার ওপর সম্মতি আদায়ের জন্য তিনি ভূট্টোকে ঢাকা আসার আহবান জানিয়েছেন (আহমদ, মওদুদ, ২০০৩:১৯৬)।

এই সময়ে আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করে মূলত: পূর্ব পাকিস্তানে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা নির্দেশ করে অন্তর্বতীকালীন সময়ের জন্য একটি খসড়া ঘোষণাপত্র প্রণয়ন ও দাখিল করা। খসড়া ঘোষণাপত্রটিতে প্রদেশের নাম 'পূর্ব পাকিস্তানের' স্থলে 'বাংলাদেশ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। 'পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র' বহাল রেখে ১২টি ধারায় ফেডারেল বিষয়াদির বিবরণ দিয়ে আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা দেয়া হয় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার হাতে। ফেডারেল তালিকা থেকে বৈদেশিক বাণিজ্য বৈদেশিক ঋণের অধিকার বাতিল করা হয়। 'খসড়া ঘোষণাপত্র স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বহাল' এবং 'রাজধানী ও সুপ্রীম কোর্ট ইসলামাবাদ' বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়। আসলে আওয়ামী লীগ দাখিলকৃত পরিকল্পনায়, অন্ততপক্ষে কেন্দ্রের হাতে কতিপয় চূড়ান্ত ক্ষমতা বহাল রেখে একটি একক সার্বভৌম পাকিস্তান গঠনের বিধান রাখা হয়েছিল (আহমদ, মওদুদ, ২০০৩:১৯৯)।

ইয়াহিয়া এবং মুজিব যখন এই চুক্তিতে আসেন যে একটি ঘোষণার মাধ্যমে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে, প্রথমে প্রদেশসমূহ এবং পরে কেন্দ্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে এবং অন্তবর্তীকালীন পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বায়ত্বশাসন দেয়া হবে।– এরকম পরিস্থিতিতে ভূট্টো ঢাকায় আসেন। ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে ভূট্টো দাবী করেন–

ক) কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

খ) দুই অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

গ) ক্ষমতা হস্তান্তর ও সংবিধান প্রণয়ন উভয় বিষয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি একক ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

মুজিব উপরোক্ত বিষয়গুলোর সঙ্গে ইতিপূর্বে দ্বিমত পোষণ করলেও ভূট্টোর সঙ্গে একমত হওয়ার স্বার্থে শেষাবধি তিনি একটি আপোষ ফর্মুলা হিসেবে অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয় পরিষদ চিহ্নিত করে নেয়ার প্রস্তাব মেনে নেন যাতে করে ভূট্টো অন্তত: পশ্চিম পাকিস্তানে সামগ্রিক ভাবে তার নেতৃত্ব বহাল রাখতে পারেন (আহমদ, মওদুদ, ২০০৩:২০০)।

এর বিনিময়ে মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের জন্য পর্যাপ্ত স্বায়ত্বশাসন সম্বলিত শাসন-তান্ত্রিক ক্ষমতার গ্যারান্টি দাবী করলেন। ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের পরে ভূট্টো একে 'সুফলদায়ক ও সন্তোষজনক' বলে আখ্যায়িত করে জনগণকে এমন একটা ধারণা দিলেন যে তারা একটি সমঝোতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন। বৈঠকে আলোচনা রাজনৈতিক সমঝোতার পথে অগ্রগতি বিবেচনা করে ২৫শে মার্চ অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় (আহমদ, মওদুদ, ২০০৩:২০০)।

গোটা আলোচনার মোড় ঘুরে যায় ২৩ ও ২৪ মার্চ। প্রস্তাবিত খসড়া ঘোষণাপত্রের উপর বিশদ আলোচনাকালে ভূট্টো অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানকে বাড়তি কোন স্বায়ত্বশাসন দেয়ার প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে থাকেন আরও মতামত ব্যক্ত করে বলেন– '... পূর্ব পাকিস্তানের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিলে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে এবং তখন মুজিবের যে কোন ঘোষণাবলে

পূর্ব পাকিস্তান একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে।' ২৪শে মার্চ সন্ধ্যায় সর্বশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রদেয় স্বায়ত্বশাসনের সেই পুরনো প্রশ্নে বৈঠক মুলতবী হয়ে যায় (আহমদ, মওদুদ, ২০০৩:২০০)।

এসময়ের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে মওদুদ আহমেদের বিবরণ :

> ইয়াহিয়া এবং মুজিবের মধ্যে যে সমঝোতাই হোক না কেন, বাস্তব অবস্থা ছিল এই যে ইতিমধ্যে সেনাবাহিনী তাদের সবরকম যুদ্ধোপকরণ সজ্জিত করে যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে নেয়। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে এমভি সোয়াত নামের জাহাজ ৩রা মার্চ থেকেই চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙ্গরের অপেক্ষায় বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছিল। পিআইএ বিমান থেকে আরো ঘন ঘন ফ্লাইটে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেসামরিক পোষাকে সৈন্য আমদানী করা হচ্ছিল। ... স্ট্রাটেজিক পয়েন্টগুলোতে বসানো হয়েছিল ভারী কামান ও মেশিনগান। পাকিস্তানের সুকৌশলী এস. এম. জি কমান্ডো গ্রুপের ঢাকা আগমনের তথ্যও ঢাকার সাংবাদিকদের কাছে এসে পৌঁছাচ্ছিল। মুজিব এবং ইয়াহিয়া যেখানে দেনদরবার চালাচ্ছিলেন সেই গণভবনের ভেতরে ও বাইরে মোতায়েন করা হচ্ছিল ট্যাংক বহর। অন্যদিকে যত্রতত্র জনতার ওপর সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষন এবং বাঙালি-অবাঙালিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিস্থিতিকে নিয়ে যাচ্ছিল আরো অবনতির দিকে।
>
> একদিকে রাজনৈতিক সমঝোতার বিলম্ব এবং অন্যদিকে সেনাবাহিনীর যুদ্ধোপকরণ সংক্রান্ত প্রস্তুতি জনগণকে ক্রমশ অশান্ত করে তোলে। ১৮ই মার্চ তারিখে এম ভি সোয়াত জাহাজ চূড়ান্তভাবে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙ্গর করলে হাজার হাজার লোক বন্দর এলাকা ঘেরাও করে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং সেনাবহরের সরঞ্জামাদি খালাস করতে বাধা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। সেনাবাহিনী জনতার বিপক্ষে অবস্থান নিলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। জয়দেবপুরে অস্ত্র ও গোলাবারুদবাহী আর্মি ট্রাক বহর এসে পৌঁছলে একই দৃশ্যের অবতারণা ঘটে।
>
> ... কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি ২৩শে মার্চ সারাদেশে পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে প্রতিরোধ দিবস পালন করে এবং প্রতিটি ভবনে পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের নির্দেশ দেয়। ঢাকার সকল দৈনিক পত্রিকা 'পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে 'বাংলাদেশের মুক্তি দিবস' হিসেবে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে।' ... সেদিন কোন ভবনেই পাকিস্তানী পতাকা দেখা যায়নি এবং সবর্ত্রই উত্তোলন করা হয় বাংলাদেশের পতাকা (আহমদ, মওদুদ, ২০০৩:২০২)।

স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রতিটি ভবনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের নির্দেশ সব জায়গায় প্রতিপালিত হলেও শেখ মুজিব নিজে তার বাড়িতে উক্ত পতাকা উত্তোলন করেননি। গোটা মার্চেই মুজিব সতর্কতার সঙ্গে পথ চলছিলেন শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য (Jahan, Rounaq, 2005:56)।

২৫শে মার্চ সকালে ভূট্টো ইয়াহিয়াকে জানান 'পূর্ব পাকিস্তান যে ধরনের স্বায়ত্বশাসন চাচ্ছে তা স্বায়ত্বশাসনের যুক্তিযুক্ত সংজ্ঞা নয়। ... তিনি একই সঙ্গে কেন্দ্র এবং প্রদেশের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানান।' একেবারে শেষ মুহূর্তে এমনকি ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়ার কাছ থেকে আওয়ামী লীগ খসড়া ঘোষণাপত্রের ঘোষণা শোনার প্রত্যাশায় ছিল। কিন্তু শেখ মুজিবকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না জানিয়ে ইয়াহিয়া ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় আকস্মিক ঢাকা ত্যাগ করেন (Jahan, Rounaq, 2005:56)। ২৫ শে মার্চ রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটায় সেনাবাহিনী নিরস্ত্র নয় আবার সশস্ত্র নয় কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনগণের ওপর হায়েনার হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে[৩] একই রাত্রে আনুমানিক রাত্রি ১টায় শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়।[৪]

মধ্য মার্চ থেকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের যুক্তিযুক্ত সমাপ্তি টেনেছেন মওদুদ আহমেদঃ

'শেখ মুজিব পাকিস্তানের ভাঙ্গন প্রতিরোধ করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালালেও ভূট্টো সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেরকমই ত্বরান্বিত করলেন। মুজিব এখানে ব্যর্থ হয়েছেন, কারণ তিনি তার সংস্কারমুখী তরুন জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। পক্ষান্তরে ভূট্টো তাতে সফল হয়েছেন কারন তাঁর পরিকল্পনা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর বর্ণবাদী ও উপনিবেশিক চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ভূট্টো দ্রুততর গতিতে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি যে শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তারা চাইছিলেন একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পাকিস্তানের প্রশাসন ব্যবস্থা, যেখানে পূর্ব পাকিস্তানে কেবলমাত্র একটি বাজার হিসেবে বিবেচিত হবে। অন্যথায় এটি ভেঙ্গে গেলেও তাদের কোন ক্ষতি ছিল না। কাজেই এর মাঝামাঝি বিকল্প সমাধানের চিন্তা তারা করেননি।'(আহমদ, মওদুদ, ২০০৩:২০২)।

## চার

তালুকদার মনিরুজ্জামান (১৯৮০) দেখিয়েছেন, ১৯৭০ সালের নির্বাচনী প্রচারাভিযানে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বার্তা প্রায় ০৩ কোটি জনগণের কাছে সরাসরি পৌঁছেছেন। নির্বাচনের প্রচারণার সময় শেখ মুজিব 'প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন' এর উপর জোর দেন। নির্বাচনকে ছয় দফা দাবী আদায়ের প্লাটফর্ম মনে করতেন। নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর মুজিব ঘোষণা করেন বাংলাদেশের মানুষ ছয় দফা অনুমোদন করেছে, তাই সংবিধান ছয় দফার আলোকেই প্রণীত হবে। ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারী রেসকোর্স ময়দানে বেনজীর শপথ অনুষ্ঠানের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই শপথ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গোটা সংগ্রামে শেখ মুজিবের প্রভাব ও কর্তৃত্ব পূর্ণ মাত্রা পায়। এর পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় ১লা মার্চ যখন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা এল তখন ঢাকার সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে ঢাকা শহর মিছিলের শহরে পরিণত হয়। ঢাকার পূর্বানী হোটেলে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ব্যস্ত। সব মিছিলের গন্তব্য হয় উক্ত হোটেল। আক্ষরিক ভাবেই জনতা তখন শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের মুখাপেক্ষী। শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষিত কর্মসূচীই হয়ে ওঠে পূর্ব বাংলার আপামর জনতার কর্মসূচী। তাই ০২রা মার্চের ঢাকার হরতাল গোটা প্রদেশের হরতালে পরিণত হয়। ৭ই মার্চ পর্যন্ত মুজিব সবাইকে কাজ বন্ধ করার আহবান জানিয়ে আমলাতন্ত্র অচল করে দেন। ৭ই মার্চের বিখ্যাত ভাষণের মাধ্যমে সাধারণ্যে এই ধারণা ছড়িয়ে দেন যে দেশের নিয়ন্ত্রণ কার্যত বাংলাদেশীদের হাতেই, যার নেতৃত্বে রয়েছেন শেখ মুজিব। ১৫ই মার্চের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের ওপর মুজিবের কর্তৃত্ব ও প্রভাব নিরঙ্কুশ হয়। ফলে আমলাতন্ত্র ও ব্যবসা-বাণিজ্য থমকে যায়। ১৫ই মার্চ তিনি তাঁর বিখ্যাত ৩৫ দফা নির্দেশমালার মাধ্যমে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের ওপর তার কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেন। সামরিক সরকারের কর্তৃপক্ষ তখন পর্যন্ত কোনো স্তরে হস্তক্ষেপ করেনি, আর মুজিব একের পর এক সতর্ক পদক্ষেপ নিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৬ই মার্চ থেকে ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে গেলেও গোটা সংগ্রামের উপর শেখ মুজিবের কর্তৃত্ব ও প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় অব্যাহত ছিল। ২৩শে মার্চ 'পাকিস্তান দিবস' এর পরিবর্তে 'বাংলাদেশ মুক্তি দিবস' পালনের মাধ্যমে আক্ষরিকভাবে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের উষাপর্বের চূড়ান্ত পর্বে উপনীত হয় দেশ। ঐদিন গভর্নর হাউস, সেনানিবাস এবং প্রেসিডেন্ট হাউজেই শুধুমাত্র চাঁদ তারা খচিত পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলিত হয়। সারা দেশেই লাল সবুজ পতাকায় ছেঁয়ে যায়। মার্চের ২৪ ও ২৫ তারিখ ত্রিপক্ষীয় আলোচনার ফলাফল কি হচ্ছে সেটা জানার জন্য জনগণের নিরন্তর অনুসন্ধিৎসা থাকলেও উৎকণ্ঠা ছিল না কারন তারা তাঁদের মুক্তির ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পর থেকে ২৫ শে মার্চ পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহের কারিগর সাধারণ জনতা তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এমন একজন, যিনি নিজেকে তিলে তিলে এমনকি ২৫ শে মার্চ পর্যন্ত একজন নিয়মতান্ত্রিক উদারপন্থী

রাজনীতিবিদ হিসেবেই উপস্থাপন করেন। ত্রিপক্ষীয় আলোচনা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দেখানো হয়েছে উদারপন্থী রাজনীতিবিদ হিসেবে এখানেও শেখ মুজিব আশাতীত সফলতা দেখিয়েছেন। উক্ত আলোচনার ব্যর্থতার দায়ভার ভূট্টোর উপর গেছে। এখানেই মুজিবের সফলতা। ২৫ শে মার্চ যখন নিজ দেশের সেনাবাহিনী নিজ দেশের নাগরিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখনই মুলত: নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি শেষ হয়ে গেছে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের উষাপর্বেরও সমাপ্তি ঘটেছে। এমন একটি মুহূর্তে এসেও শেখ মুজিবুর রহমান অসামান্য দূরদর্শিতা দেখিয়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মূলপর্বের ভিত্তি গড়ে দেন।

---

**টীকা ও তথ্যসূত্র :**

১. বর্তমান প্রবন্ধে ১৯৭১ সালের মার্চের ঘটনাপ্রবাহকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের উষাপর্ব হিসেবে চিহ্নিত করব। কারণ পরিপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্বেই এই সময়কার পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি ছিল অগ্নিগর্ভ। পরিস্থিতি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে এই সময়কাল নিয়ে রচিত গ্রন্থাদি, পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট ও আনুষাঙ্গিক দলিল বিভিন্ন ভাষায় চিত্রিত করা হয়েছে। যেমন: *Bangladesh Documents Vol-I (1999)*-এ মার্চের সময়কালকে 'Civil disobedience' হিসেবে, তালুকদার মনিরুজ্জামান, তাঁর *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath (1980)* গ্রন্থে উক্ত সময়কালকে 'The defacto government of Sheikh Mujib হিসেবে, লে. জেনারেল গুল হাসান তাঁর '*পাকিস্তান যখন ভাঙলো*' গ্রন্থে 'শেখ সাহেবের পূর্ণ কর্তৃত্ব' হিসেবে, শ্যামলী ঘোষ (২০০৯), তাঁর *আওয়ামী লীগ ১৯৪৯-৭১* গ্রন্থে 'পরোক্ষ প্রতিরোধ' হিসেবে চিত্রিত করেছেন।

২. বিস্তারিত দেখুন: (Talukder, Moniruzzaman, 1980:75) '... শেখ মুজিব একজন মনোমুগ্ধকর বক্তা, যিনি মার্চ ১৯৬৯-ডিসেম্বর ১৯৭০ পর্যন্ত সময়কালে ৩৫টি শহর, সব জেলা সদর এবং বিভাগীয় শহর, প্রায় ৪০০টি থানা। শহরের জনসভাগুলোতে গড়ে ১ লক্ষ, জেলা এবং বিভাগীয় শহরগুলোর জনসভায় গড়ে ০২ লক্ষ, থানায় গড়ে ৫০,০০০ লোক আসত এবং মুজিবকে স্বাগত জানাত। এভাবে দেখা যায় প্রায় ০৩ কোটি জনগণের কাছে শেখ মুজিবের বক্তব্য সরাসরি পৌছায়।'

নির্বাচনী প্রচারাভিযান সম্পর্কে শ্যামলী ঘোষ (২০০৭) গুরুত্বপূর্ণ দিকের উন্মোচন করেছেন, বিস্তারিত দেখুন: শ্যামলী ঘোষ (২০০৭ :১৮৭), *আওয়ামী লীগ ১৯৪৯-১৯৭১*, ঢাকা, ইউপিএল, (২০০৭ :১৮৭), '... ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর পরবর্তী সফরকালে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানীদের এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জনসাধারণের উন্নতিই আওয়ামী লীগ কার্যক্রমের লক্ষ্য। পরে এমন এক সাধারণ ধারণা গড়ে উঠে যে, মুজিব যদি আরও আগে পশ্চিম পাকিস্তানের অবশিষ্টাঞ্চল সফর করতেন এবং আওয়ামী লীগের অবস্থান ও ভূমিকা ব্যাখ্যা করতেন তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানে যথেষ্ট সমর্থন নিশ্চিত করা সম্ভব হতো। অবশ্য আওয়ামী লীগের কর্মসূচীর ব্যাপারে বলতেই হয়, এতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান সমর্থন ছিল এক ইউনিট বিলোপকেন্দ্রিক। আর স্বায়ত্বশাসন প্রশ্নে কিছু সমর্থন থাকলেও তা কোনো কোনো পকেট এলাকায় মাত্র।... কিন্তু পিপিপির অভ্যুদয়ে আওয়ামী লীগের সেই সম্ভাবনা মাটি হয়ে যায়। তাই পশ্চিম পাকিস্তানে প্রান্তিক প্রভাব প্রতিক্রিয়া দৃষ্টে পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে সুনিশ্চিত সাফল্যের প্রতি আওয়ামী লীগের মনোযোগ বেশী করে পড়াটাই স্বাভাবিক।'

৩. ২৫শে মার্চ ভয়াল রাত্রের কিছুটা বিবরণের জন্য দেখুন, মওদুদ আহমদ (২০০৩ : ২০৩-২০৪)।

৪. ২৫মে মার্চ সন্ধ্যায় মুজিব তাঁর আশপাশের সকল সহকর্মীকে তাৎক্ষণিকভাবে শহর ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন আর নিজে নিজ বাসভবনে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেন। মার্চের ত্রিপক্ষীয় আলোচনা ভূট্টোর গোয়ার্তুমিতে শেষ হয়ে যাওয়ায় বল যেমন মুজিবের কোর্টে ছিল না, বল ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের কোর্টে, দায় দায়িত্ব ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের। তাঁর নিজ বাস ভবনে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল সূদুর প্রসারী এবং তাৎপর্যপূর্ণ। ২৫শে মার্চ নিজ দেশের সেনাবাহিনী যেমন নিজস্ব জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হানাদার এর ভূমিকা নিয়ে নৈতিকভাবে পরাজিত হয় তেমনি শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে

তাঁকে নিয়মতান্ত্রিক উদারপন্থী রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয়। ঐদিন যদি শেখ মুজিব পালিয়ে যেতেন তাহলে তাঁকে হয়ত ভারতে আশ্রয় নিয়ে (অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের মতো) গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে হত। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানীরা নিশ্চিতভাবে মুজিবকে দেশদ্রোহী, ভারতীয় চর হিসেবে চিত্রিত করে জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে 'ভারতীয় চক্রান্ত' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত। মুজিবের অসামান্য দূরদর্শিতায় ২৫শে মার্চের ভয়াল রাত্রে জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম মহিমান্বিত হয়। মোটা দাগে– ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে শেখ মুজিব ছাড় দিয়ে যেমন জয়ী হন তেমনি ২৫শে মার্চ স্বেচ্ছায় গ্রেফতার হয়ে গোটা পরিস্থিতির উপর নিজ পরিকল্পনা অনুসারেই জয়ী হন।

## গ্রন্থপঞ্জী


Bangladesh Documents, Vol-1, (1999), Dhaka: University Press Ltd.

Jahan, Rounaq (1994) Pakistan: Failure in National Integration, Dhaka: University Press Ltd.

Jahan, Rounaq (2005), Bangladesh Politics: Problems and Issues, Dhaka: University Press Ltd.

Jalal, Ayesha (1997), Democracy and Authoritarianism in South Asia, Great Britain; Cambridge University Press

Richard Sisson and Leo Rose (1990), Pakistan, India and The creation of Bangladesh, Berkeley: University of California Press.

Talukder, Moniruzzaman, (1980), The Bangladesh Revolution and Its aftermath, Dhaka. Bangladesh Book International Ltd.

Talukder, Moniruzzaman, (2003), Radical Politics and Emergence of Bangladesh, Dhaka: Mowla Brothers.

Van Schendel, Willem (2009), History of Bangladesh, New Delhi: Cambridge University Press

হসান, মঈদুল (২০১৫), উপধারা একাত্তরঃ মার্চ-এপ্রিল, ঢাকা, প্রথমা।

ঘোষ, শ্যামলী (২০০৭), আওয়ামী লীগঃ ১৯৪৯-১৯৭১, ঢাকা, ইউপিএল।

খান, গুল হাসান (২০০৯), পাকিস্তান যখন ভাঙলো, ঢাকা, ইউপিএল।

রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পাদিত, ১৯৮২), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

আহমদ, মওদুদ (২০০৩), বাংলাদেশ স্বায়ত্বশাসন থেকে স্বাধীনতা, ঢাকা, ইউপিএল।

রহমান, মাহবুবর (২০০৬), বাংলাদেশের ইতিহাসঃ ১৯৪৭-১৯৭১, ঢাকা, সময় প্রকাশন।



**[Abstract:** This paper aims to explore that, after the postponement of the session of the national assembly in1971, how did the authority of Awami league and Sheikh Mujibur Rahman in East Bengal dissolve the existence of Pakistan as a parallel government? It will be further examine how the political movement took shape in the national liberation movement? This study covered the period from 1st March to 25th March 1971. This paper explained the nature of the movement by showing that the national liberation movement basically started with the spontaneous protest of the people of East Bengal after Yahya Khan announced the postponement of the session of the national assembly on 1st March. This reaction basically undermined the existence of the then polity and parallel government of Sheikh Mujibur Rahman in East Bengal dissolved the existence of Pakistan.]